Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 1 - 9
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় মধ্যযুগীয় পর্ব : চণ্ডীমঙ্গলকাব্য এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর স্বতন্ত্র কাব্যভাষা

ড. লতিফ উদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চাপড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া,পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইল : uddin231496@gmail.com

Keyword
বাংলা ভাষা, মুসলমান শাসক, মঙ্গলকাব্য, দেবী চণ্ডী, কবি মুকুন্দরাম, স্বতন্ত্রতা, সমাজ গঠন, জীবন দর্শন, কবি প্রতিভা।

Abstract
বাংলা সাহিত্যের সূচনা প্রাচীনযুগে হলেও এর বিস্তার ঘটেছিল মধ্যযুগীয় পর্বে। যদিও তা খুব সহজে হয়নি। সংস্কৃত আরবি ফারসির পরিবর্তে মার্তৃভাষায় সাহিত্যচর্চা সেদিন অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল। তবে মধ্যযুগের বাংলার মুসলমান শাসকদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা এই পর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিভিন্নধারায় ও রূপে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে যার অন্যতম হল মঙ্গলকাব্য। যা পরবর্তী বেশ কয়েকটি শতকে একটি নির্দ্দিষ্ট প্যাটার্নকে অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছে। এই মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম চণ্ডীমঙ্গলকাব্য। আমাদের আলোচনায় এসেছে মঙ্গলকাব্য রচনার ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সাধারণ কারণসমূহ। প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছে দেবী চণ্ডীর উৎস সন্ধান। বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে চণ্ডীমঙ্গল তথা মধ্যযুগের কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যের স্বতন্ত্র কাব্যভাষা। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে সেদিনের সমাজ জীবনের বাস্তব নিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এটাই তাঁর কাব্যের বড় দিক নয়। পাঠান-মোগল সংঘর্ষের ভাঙা গড়ার এক বিশেষ পর্বে কবিকে অত্যাচারিত হয়ে গৃহ ত্যাগ করতে হয়েছিল। কবি লিখেছেন সেসব কথা কিন্তু কোথাও ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ পায়নি। প্রকৃত সাহিত্যিকের মতো নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এঁকেছেন সবকিছু। অদ্ভুত এক মানব মমত্ববোধ লক্ষিত হয়েছে তাঁর লেখায়। যা হয়েছে কেবল তার বিবরণ দেননি যা হওয়া উচিত তাকেও দেখিয়েছেন। আক্ষেটি খণ্ডে কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মাণ অংশে বহু ধর্ম জাতিতে বিভিক্ত ভারতবর্ষে কিভাবে সামাজিক সমন্বয় সম্ভব তার পথ দেখাতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছে তাঁর লেখনীর বিভিন্ন দিক কবি প্রতিভার নিজস্বতা। আলোচনায় এসেছে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির অসামান্য দক্ষতা। মানব জীবন ও সমাজ সম্পর্কে যে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল তা বেশ বোঝা যায়। চরিত্র সৃষ্টির স্বকীয়তা,চরিত্র উপযোগী ভাষা নির্মাণ, নিজস্ব জীবনদর্শনকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে তিনি যে কাব্যভাষা নির্মাণ করলেন এই আধুনিক যুগেও তা খুব বেশি লক্ষিত হয়না। মুকুন্দরাম তাই একইসাথে সমকালীন ও চিরকালীন।

Discussion

বাংলা সাহিত্যের উষাকালে চর্যাপদ যে সাহিত্যধারার সূচনা করেছিল যাকে আমরা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় প্রাচীন যুগ বলেছি তার ধারাবাহিকতা যে ছিন্ন হয়েছিল সমকালীন ধর্ম-রাজনৈতিক কারণে একথা আমরা সকলেই জানি। বাংলার সেন রাজাদের আমলে রাজসভা কেন্দ্রিক সাহিত্য ছিল মূলত সংস্কৃত ভাষাকেন্দ্রিক। তার আগে অবশ্য অপভ্রংশ,প্রাকৃতে বাঙালি কবিরা দেশ সমাজ প্রেম প্রকৃতি চিত্রের নিদর্শন রেখেছেন। মাগধী অপভ্রংশের ছোঁয়া লাগা সে সব কবিতার নিদর্শন 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' পর্বে আমরা পেয়েছি। চর্যাপদের পরবর্তী কালেই নয় চর্যাপদ রচনাকালীন সময়েও বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিকাশ যে খুব একটা সহজ হয়নি তার একটা মর্মস্পর্শী পাঠ সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে পাওয়া যায়। এইখানেই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পর্বটি বিশেষ গুরুত্ব রাখে কারণ সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কেবল রাজসভায় স্থান পেল তাই নয় লোকজীবন ও সাহিত্য পাদপ্রদীপের সামনে উঠে এল। শাসক এবং সময় ও সমাজের চাহিদা যা চিরকাল সাহিত্যের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপবিন্যাস ঘটালো। মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে তাই যতই ধর্মকেন্দ্রিক গতানুগতিক বলি না কেন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ধারা এবং রূপের সাহিত্য চর্চা এ সময় থেকেই বাঙ্গালা সাহিত্যে বিস্তার লাভ করেছিল।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন যদিও বলেছেন তুর্কী আক্রমণ পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষা রাজদরবারে স্থান পায় তবুও বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিকাশ পথ বেশ বন্ধুর। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)' গ্রন্থে তাঁর পর্যবেক্ষণ-

> "মুসলমানগণ ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ রূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘন্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল বাস-নিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতুহল হইল।"[১]

শাসকের এই আগ্রহ বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার পথকে সুগম করলেও ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক স্তর থেকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা নিয়ে প্রতিরোধ তৈরি হয়েছিল। যে কোনো ভাষার প্রাথমিক সাহিত্য বিকাশে অনুবাদের ভূমিকা সবচেয়ে বড়। যখন উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টির মনন পল্লবিত হয়নি তখন অনুবাদ সহজেই সেই জায়গা নিতে পারে। কিন্তু বাদ সেধেছে সেখানেই।সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাসকে 'সর্বনেশে' আখ্যা দেওয়া হয়েছে এই সময়। একই ধরনের কথা বলেছেন ইউসুফ জুলেখা কাব্যের রচয়িতা মুহম্মদ সগীর। সংস্কৃত আরবি ফারসির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা সহজ হয়নি।

আমরা জানি চৈতন্য রেনেশাঁর যুগে বাংলা ভাষা সাহিত্যের সর্বাত্মক বিকাশ হয়েছিল। বলা বাহুল্যমাত্র সেই সময়ের বাংলায় হোসেন শাহের উদারপন্থী শাসন সাহিত্য বিকাশের সহায়ক ভূমিকা নেয়। কিন্তু ষোড়শ শতকের আগেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারায় একটি বিশেষ রীতির সাহিত্যের সূচনা হয় যা পরবর্তী বেশ কয়েকটি শতকে বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিকাশে অগ্রণী হয়ে ওঠে সেটি হল মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যগুলি লৌকিক দেবদেবীর পূজো প্রচলনের কাহিনি হলেও এতে বাঙালি সমাজ জীবন উপেক্ষিত হয়নি। পাশাপাশি এইগুলি পালাগানের আকারে লেখা বলে ধর্ম সংগীত সংস্কৃতির বাহক হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনায় মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বিভাগ চণ্ডীমঙ্গলকাব্য ও এই কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের কাব্য আলোচনা করে দেখব মধ্যযুগীয় কাব্যের ভাষায় কীভাবে তিনি একটা নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে স্বতন্ত্র কাব্য ভাষা তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন এবং সমন্বয়কামী সমাজ-দেশ গঠনের পরিকল্পনা দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন কেন এই বিশেষ ধারার সাহিত্য কর্মের সূচনা হল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। এই আলোচনায় বলতে হয় যে কথাটা আলচনার সূচনাতেই বলেছি তা হল সাহিত্য রচনার পিছনে সমাজ ও সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করা যায়না কোনো ভাবেই। অর্থাৎ সমসাময়িক মানুষের মানসিক চাহিদার প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটে। মধ্যযুগের ক্ষেত্রে এই মানসিক চাহিদা বা ক্ষিদে অনেকক্ষেত্রেই জনমানসের না হয়ে কোনো একজন মানুষের হয়েছে সহজ করে বলতে গেলে রাজার বা সামন্ত প্রভুর হয়েছে। আমাদের আলোচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও তার কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও তাঁর কাব্য রচনা করেছেন পৃষ্ঠপোষক জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তার পুত্র রঘুনাথ রায়ের প্রেরণায়। তাছাড়া ভুলে গেলে চলবে না সাহিত্য ছিল বিনোদনেরও একটা মাধ্যম। আর সেই কবে থেকেই তো বাঙালি তার সমাজ ও জীবনকে ভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছে শুনতে চেয়েছে, এর মধ্যেই সে শুষে নিতে চেয়েছে জীবন রস। এই সমস্ত সাধারণ কারণগুলিকে ভুলে না গিয়েও আমরা মঙ্গলকাব্য তথা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও চণ্ডীপূজার প্রচলনের পিছনে আরো গভীর কারণগুলির অনুসন্ধান করব সমকালীন সমাজ ইতিহাস রাজনীতি ধর্ম লোকজীবনের অন্দরে প্রবেশ করে।

মঙ্গল দেবদেবী ও কাব্যের উৎসমুখ অনুসন্ধানে আমরা ফিরে যাব রাজধানীর অদূরে বয়ে চলা চিরন্তন গ্রামজীবনে। বাংলার গ্রামজীবনে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের চাওয়া পাওয়া ভয় ভীতি থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন ব্রত পালন করে এসেছে বহুকাল থেকে। পুণ্যপুকুর ব্রত, ইতু ব্রত ইত্যাদি বিভিন্ন ব্রত পালনের সঙ্গে ছড়া, গল্প বলার চল ছিল। মঙ্গল দেবীদের তুষ্ট করার পিছনেও লোকজীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন চাওয়া পাওয়া ভয় ভীতি কাজ করেছে। হয়ত ব্রতের এই রীতি থেকেই মঙ্গলকাব্যের দেবতা-দেবীদের নিয়ে গান রচনার সূচনা হয়েছে।

এর সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক সমন্বয়ের একটা ক্ষেত্রও আছে। আর্য অনার্য তথা লোক জীবন ও পৌরাণিক ভাবধারার বা সংস্কৃতির সমন্বয়ের সূচনা তুর্কী আক্রমণের অনেক আগেই শুরু হয়েছিল এদেশে। অনার্য দেবদেবীরা পৌরাণিক নানা অনুষঙ্গে আর্যমণ্ডলে স্থান পেয়েছে। তুর্কী আক্রমণের পর পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোয় নিজেদের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাকে দূর করতে তা আরো দ্রুত হয়ে পড়ল হিন্দু সমাজে। সেই কারণেই ব্যাধ-জাতির আরাধ্যা দেবী বা 'যোষিতামিষ্ট দেবতা' চণ্ডী সহজেই মিশে গিয়েছেন শিবপত্নী পাবর্তীর সঙ্গে। মনসা হয়েছে শিবের কন্যা। আর মঙ্গলকাব্যগুলিতে তো এটাই দেখি সমাজের উচ্চকোটিতে স্থান লাভের বাসনা লৌকিক দেবমণ্ডলের। চণ্ডীমঙ্গলে অরণ্য-চর ব্যাধ কালকেতু এবং তার স্ত্রী ফুল্লরার পূজো পেয়ে সন্তুষ্ট নন দেবী চণ্ডী, বণিক ধনপতির পূজাও তার চায়। হয়তো তাই দ্বিজ মাধব, চক্রবর্তী মুকুন্দরাম লৌকিক দেবী চণ্ডীকে নিয়ে পালাগান লেখেন।

চণ্ডীমঙ্গলের পূজিতা দেবী চণ্ডীর অস্তিত্ব সন্ধানে ড.সুকুমার সেনের পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবধারার সমন্বয়ের কথা বলেছেন-

> "চন্ডীমঙ্গলের অধিদেবতা দুর্গা অরণ্যানী বা বিন্ধ্যবাসিনী, তবে তিনি চণ্ডমুণ্ড মহিষাসুর বিনাশিনী নহেন; তিনি অভয়া। তাই প্রচীন চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতারা তাঁদের কাব্যকে বেশির ভাগ অভয়ামঙ্গলই বলিয়াছেন।"[২]

তিনি এই বনদেবী অভয়ার অস্তিত্ব যে আর্যমণ্ডলে ছিল তা ঋকবেদের দশম মণ্ডলে উল্লেখিত একটি স্তব থেকে দেখিয়েছেন। তিনি দুর্গার দুই রূপভেদের কথা বলেছেন তা হল মহিষাসুর, শুম্ভনিশুম্ভ বধ কারিনী এবং বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। দুই রূপেরই নামান্তর হয়েছে চন্ডী নামে-

> "প্রথম দুর্গার বেলায় চণ্ডবিনাশিনী বলিয়া চণ্ডী নাম খুবই সার্থক। দ্বিতীয় দুর্গা অভয়া ও জীবধাত্রী বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল মঙ্গলচণ্ডী বা অভয়া দুর্গা। চন্ডীমঙ্গল পাঁচালীতে ইহাই দেবীর বিশিষ্ট নাম।"[৩]

তাঁর আলোচনার সূত্র থেকে যেটা পাওয়া যায় তা হল দুর্গা-অভয়ার পূজার সঙ্গে দুর্গা-চন্ডীর পূজার মিশ্রণ ঘটেছিল। আবার মেয়েদের ব্রত কথায় বনদেবীর লৌকিক রূপের পূজা প্রচলিত ছিল। তাই দেবী চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ খণ্ডে অভয়া

দেবী রূপে যেমন আছেন তেমনি বণিক খণ্ডে খুল্লনা পূজিত ব্রত কথার হারানো পাওয়ার দেবী রূপেও আছেন। পাশাপাশি অনেকে এটাও বলেন যে আর্যপূর্ব আদিবাসী জাতি ওরাওঁ ইত্যাদির মধ্যে প্রচলিত চান্দী নামে কোন এক দেবী থেকেই মঙ্গলচণ্ডীর উদ্ভব। এই দেবীরও বাহন ছিল গধিকা বা গোসাপ।

> "শিকার ও শস্য এই দুয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চান্দী বিবর্তনের পথ ধরে শাস্ত্রীয় দুর্গায় উন্নীত হয়েছেন।"[৪]

যাই হোক আলোচনার সূচনাতে বলেছিলাম সাহিত্য সৃষ্টির অনুঘটক রূপে সময় এবং মানুষের চাহিদার কথা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তথা মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেও দেখি সময়ের বড় ভূমিকা কাজ করেছে। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকের মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে সমাজে একটা সমন্বয় চলছিল। সমাজের উপরের অংশই এই সমন্বয়ে অধিক আগ্রহী ছিল বলেই মনে হয়। কারণ সমাজের নীচু তলার মানুষ নিজেদের অভাব অভিযোগ ও চাওয়া পাওয়া মেটাতে লৌকিক দেবদেবীর উপর ভরসা রাখল যারা ভক্তের জন্য সব কিছু করতে পারে। যারা ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারেনা। পৌরাণিক দেবদেবীদের উপর কি তারা আস্থা হারিয়েছিল? সেই কারণেই কী সামাজিক ভাঙন রোধ করতেই পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার সমন্বয় ঘটল? তবে এই সমন্বয়ের ফলে লোক ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে রাজসভার ও নাগরিক ভাষা সাহিত্যের সংমিশ্রণ ঘটল। ফলত যা ছিল লোকজীবনের সামগ্রী তা সর্বজনীন হয়ে উঠল সামাজিক-ধর্মীয় প্রয়োজনে। জনমানসের তৎকালীন চাহিদা এর প্রসার ঘটাতে সাহায্য করল। মধ্যযুগের সাহিত্য ধারায় সৃষ্টি হল মঙ্গলকাব্যের ধারা। এই সাহিত্য ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম কেবল চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখলেন না মধ্যযুগের কাব্যে পৃথক সাহিত্য ভাষা সৃষ্টি করলেন।

মধ্যযুগের অন্য কবিদের থেকে মুকুন্দরাম অনেকটাই ভিন্ন সেটা তাঁর লেখনীর জন্য যতটা ততটাই তার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। সাহিত্যিকের বড় গুণ যে নৈর্ব্যক্তিকতা তা তাঁর সাহিত্যের বড় দিক। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যে নতুন কি আর থাকতে পারে যার জন্য তাঁকে আমরা অতি আধুনিক যুগেও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসি। সেটা তার জীবনভাবনা, মানুষের প্রতি প্রসন্নচিত্ততা। রাজনৈতিক পালাবদলের এমন একটা সময়ে তিনি লিখছেন যখন তাকেও অত্যাচারিত হয়ে ভিটা ছাড়া হতে হয়েছে। তিনি লিখলেন সেই ব্যথার কথা কিন্তু কোথাও ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ পেলনা। তাঁর ভাষায় প্রকাশ পেল অদ্ভুত ক্ষমা সুন্দর একটা দৃষ্টি যা মধ্যযুগের সাহিত্যের ভাষায় নতুন দিক নির্দেশ করল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডের 'পশুগণের ক্রন্দন' অংশের কথা প্রসঙ্গত চলে আসে, কালকাতুর বাণের আঘতে ক্রমাগত পশুদের প্রাণ যাচ্ছে,পশুরা সবাই মিলে দেবীর কাছে এসেছে বিচারের আসায়-ভালুকের জবানীতে মুকুন্দরাম লিখলেন-

> "উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক / নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।।"[৫]

সে তো কোনোদিন কারো কোনো ক্ষতি করেনি। নিজের মতো বাঁচতে চেয়েছে তবে কেন এই দুর্ভোগ? অসহায় নিপীড়িত মানুষের এটাই তো চিরকালীন জিজ্ঞাসা।

এই কথার উত্তরও যেন তিনি দিতে চেয়েছেন দেবীর কাছে বিচারপ্রার্থী হস্তিনীর কথার মধ্যে দিয়ে। মানুষের উন্নতি যেন তাঁর ক্ষতির কারণ-

> "বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। / লুকাইতে স্থল নাহি অরণ্য-ভিতর।।
> কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি। / আপনার দন্ত হৈল আপনার বৈরী।।"[৬]

অভিযোগ আছে কিন্তু কোথাও হিংসাত্মক আগ্রাসী মনোভাব নেই। একটা প্রসন্নময়তা রয়েছে কাব্যের ভাষায় যার মূল হল মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। তাঁর কাব্যের অন্যতম খল চরিত্র ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীলের শঠতার মধ্যেও তিনি এমনভাবে কৌতুক মিশ্রিত করেছেন যে তাদের প্রতিও মানুষের সহানুভূতি জাগে। মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে এটা রপ্ত করা সহজ নয়। কবি

নিজেও ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে ঘর ছাড়লেও অত্যাচারীর ধর্মীয় পরিচয় তার কাছে বড় হয়নি। সেই কারণেই আমরা দেখি দেবীর কৃপায় কালকেতু যখন রাজা হলেন 'গুজরাট' নগর পত্তন করলেন তখন মুকুন্দরাম সেই কল্পিত নগরীতে মুসলমানদেরও স্থান দিলেন সম্মানের সঙ্গে।

"পশ্চিম দিকেতে সেহ/তুলিল নামাজ গৃহ/দলিজ মসজিদ নানা ছন্দে"[৭]

শুধু তাই নয় তাঁর বর্ণনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উঠে এলো মুসলমান সমাজের খুঁটিনাটি অনেককিছুই। সেসব মুসলমান জীবন-সমাজ সম্পর্কে যে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল তা বেশ বোঝা যায়-

"বসিলা অনেক মিঞা/আপন তরফ নিঞা/কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।"[৮]

নিকা অর্থে বিধবা বিবাহের কথা এসেছে যা মুসলমান সমাজে সেই সময় প্রচলিত ছিল। মুসলমান সমাজের ভিতর যে বিভিন্ন শ্রেণি বিন্যাস ছিল তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। কর্ম ভিত্তিক মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন-

"রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা/তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।।
বলদে বাহিয়া নাম ধরাল্য মুকেরি/পিঠা বেচি কেহ নাম ধরাল্য পিঠারি।।"[৯]

উঠে এসেছে শিশুদের পাঠশালায় পড়ার কাথা,মোলভীর কাছে তারা শিক্ষা লাভ করতে যেত-

"যত শিশু মুসলমান/ তুলিল দলিজ খান/ মখদম পড়ান পাড়না।"[১০]

হিন্দু সমাজেরও বিভিন্ন জাতি পেশার মানুষ কালকেতুর গুজরাট নগরে স্থান পেল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র সবার আগমন ঘটল সেখানে। তাঁদের সবার জীবন ও সমাজ সম্পর্কে মুকুন্দরামের যে বিশ্লেষণী দৃষ্টি ছিল তা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। কিন্তু তাঁর কবিদৃষ্টির উল্লেখযোগ্য দিক মানব জীবন সম্পর্কে তাঁর মমত্ববোধ। তিনি কেবল শ্রেণি বিভক্ত সমাজের পরিচয় দিলেন না শ্রেণিসম্মিলনের ভাবনারও প্রকাশ ঘটালেন। সেই কারণেই গুজরাট নগরে সকলে সানন্দে বাসের অধিকার পেল, অধিকার পেল যেমন ইচ্ছা চাষ করার। কালকেতু তাদের তিন সনের খাজনা মুকুব করে দিলেন। বুলান মণ্ডলকে নিয়োগ করলেন প্রজার কল্যাণের জন্য। মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে তিনি যে ভাবনার প্রকাশ ঘটালেন তা যেন বহু ভাষা ধর্ম ও জাতিতে বিন্যাসিত মজবুত ভারত গঠনের সূচনা। অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন-

> "কালকেতু চণ্ডীর আশীর্বাদে নতুন রাজ্য স্থাপন করল; সেখানে সমাজের অন্তর্গত কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়েরই কোনো অমর্যাদা হবে না; কোনো অকল্যাণ-বুদ্ধিই সেখানে জয়যুক্ত হবে না; সেখানে চাওয়া বৃথা আশায় কেঁদেকুটে মরবে না, সার্থক পাওয়ায় পরিণত হবে। ...সুতরাং কোনো সম্প্রদায়কে বা কোনো ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়েই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে।"[১১]

মুকুন্দরামের ভাষা ও কাব্যের স্বতন্ত্রতা বিশ্লেষণ সহজ হয়ে যাবে যদি আমরা মধ্যযুগের অপর বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রেকে এই আলোচনায় নিয়ে আসি। দুজন কবি দু-রকম ভাবে সমাজকে দেখেছেন। ভারতচন্দ্রের ভাষায় ছিল তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী যাকে আমরা স্যাটায়ার বলি তাই। নাগরিক বুদ্ধিদীপ্ততাকে হাতিয়ার করে তিনি উইট ও স্যাটায়ারের জাল বুনেছেন। বাঁকা হাসির ছটা আছড়ে পড়েছে সমাজের সর্বত্র। ভারতচন্দ্রেরও কবিদৃষ্টিতে দূরদর্শিতা ছিল। অন্নদামঙ্গল কাব্যের গ্রন্থসূচনা অংশে বর্গী আক্রমণের কারণ হিসাবে আলিবর্দীর পাপের ফলের কথা বললেও

"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।/বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।।"[১২]

এ কথাও তিনি বলতে ভোলেন নি। কাব্যসৃষ্টির কলাগঠনে মুকুন্দরাম অবশ্য ভিন্ন পথ ধরেছেন স্যাটায়ার নয় তিনি হিউমারের সৃষ্টি করেছেন। নির্মল শুভ্র হাস্যরসের ছোঁয়া লেগেছে কাব্য ভাষার সর্বত্র। গুজরাট নগরে আসা মানুষের কথা বলতে গিয়ে বৈদ্য বা চিকিৎসকদের প্রসঙ্গে কী অনায়াসে তিনি বলেন-

"গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে।।
দেখি জ্বর শিরোরোগ ঔষধ করয়ে যোগ
বুকে ঘাত করে প্রতিজ্ঞায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়।"[১৩]

কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি সম্পর্কে নয় ব্রাহ্মণদের নিয়েও তিনি কৌতুক করেছেন-

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে/নগরে যাজন করে/শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।।
চন্দন-তিলক পরে/দেব পুজো ঘরে ঘরে/চাউলের কোঁচড়া বান্ধে টান।"[১৪]

এছাড়াও কুম্ভকার, মালী, নাপিত, কাঁসারি সূবর্ণবণিক, বাইতি, দরজী, সিউলি, ছুতার, পাটনী প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের জীবনের টুকরো টুকরো ছবি তিনি তুলে ধরেছেন যা তাঁর গভীর সমাজ পর্যবেক্ষণের ফল।

মুকুন্দরাম সম্পর্কে আলোচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তিকে উল্লেখ করতেই হয়-

> "দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি একজন কবি না হইয়া ঔপন্যাসিক হইতেন তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।"[১৫]

এই আলোচনার মধ্যেই বলে নিতে অধুনা তাঁর নামের সঙ্গে রাম শব্দ যোগ নিয়ে অনেকেই আপত্তি তুলেছেন যদিও সুখময় মুখোপাধ্যায়[১৬] সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু তার কাব্যের রচনাকাল নিয়ে একটা বিতর্ক রয়ে গিয়েছে।

রচনাকাল নিয়ে বির্তক থাকলেও মুকুন্দরামের প্রতিভা নিয়ে কোনো বির্তক নেই। এ যুগে জন্মালে তিনি সত্যিই ঔপন্যাসিক হতেন। জীবন অভিজ্ঞতা, নিপুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বাস্তবতাবোধ, দর্শন, কাহিনি বিন্যাস ভাষা ব্যবহারের নিপুণতা সবেতেই তিনি আধুনিক ঔপন্যাসিক সুলভ প্রতিভার অধিকারী। মুকুন্দরামের বাস্তবতাবোধ জীবনদর্শন তাঁকে যে মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে আলাদা একটা স্থান দিয়েছে এ বিষয়ে এ যুগের অন্যতম সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুন্দরামকে মধ্যযুগের ইংরেজ কবি চসার ও ক্র্যাবের সঙ্গে তুলনায় এনেছেন। মুকুন্দরাম এদের সমপর্যায়ে না পড়লেও খুব একটা পিছিয়েও নেই। প্রাচ্য সাহিত্যরসিক ই.বি.কাউয়েল এ বিষয়ে লিখেছেন-

> "It is this vivid realism which gives such a permanent value to the description. Our author is the crabbe among Indian poets and his work thus occupies a place which is entirely its won."[১৭]

মুকুন্দরামের স্বতন্ত্রতার সবচেয়ে বড়দিক তাঁর চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা। এ বিষয়ে তাঁর ভাষা ব্যবহার সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। সেই জন্যেই চরিত্রগুলোর মুখের ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই প্রবাদে পরিণত হয়েছে। রাজা কালকেতুর কাছে ভেট নিয়ে আগত ভাঁড়ু দত্তের বর্ণনা তিনি যে ভাষায় দেন তা এক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে-

"ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ/ ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব/শ্রবণে কলম খরশাণ।।"[১৮]

শঠ ভাঁড়ু দত্তকে খুব সহজেই তিনি চিনিয়ে দেন। ভাঁড়ু দত্ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি স্বতন্ত্র চরিত্র যে মুকুন্দরামের কলমে সজীব হয়ে উঠেছে। এই ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর কাছ থেকে পাওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে, কালকেতুর তিরস্কারে তার সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ বাধায়, প্রবঞ্চনা করে কালকেতুকে কলিঙ্গরাজের হাতে তুলে দেয় কিন্তু শেষকালে কালকেতু যখন দেবীর কৃপায় কালকেতু মুক্তিলাভ করে তখন অকপটে তার কাছে এসে বলতে বাধে না-

"তুমি খুড়া হৈলে বন্দী/অনুক্ষণ আমি কান্দি/বহু তোমার নাহি খায় ভাত"[১৯]

মুকন্দরামের চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনায় ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে যেমন আমরা অজস্র চরিত্র পাই এবং তারা প্রত্যেকেই অন্যদের থেকে আলাদা মুকুন্দরামেও তাই।

মুকুন্দরাম ব্যাধ কালকেতুকে ব্যাধের মতোই গড়েছেন। অতি শক্তিশালী আহারের কোনো মার্জিত ভাব নেই,সরল এতটাই যে তা বোকামির পর্যায়ে পড়ে। কালকেতু তাই ধনপ্রদায়ী দেবীকেও সন্দেহ করে যে দেবী তাকে দেওয়া ধন নিয়ে না পালায়। কালকেতুর সন্দেহের মধ্যে অবশ্য তার বোকামির থেকে বেশি লক্ষিত হয় সামাজিক স্তরভেদে নীচে থাকা মানুষের মধ্যেকার পুঞ্জিভূত অবিশ্বাস ও বেদনা -

"পশ্চাতে চন্ডিকা যান আগে কালু যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছুপানে চায়।।"[২০]

এ হেন কালকাতুকে শঠ ভাঁড়ু দত্ত সহজেই বোকা বানাতে পারে। কিন্তু এ সব নিয়েই তো কালকেতু তাই তাকে বণিক ধনপতির সঙ্গে এক করা যায় না। ধনপতি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র। সে বিলাসী, কৌতুক প্রিয়। মুকুন্দরামের নারী চরিত্রগুলি অধিক উজ্জ্বল। ফুল্লরা প্রকতই ব্যাধ পত্নী হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে লহনা এবং খুল্লনার তুলনা চলে না। কপট দাসী দুর্বলাও নিজস্ব বৈশিষ্টে উজ্জ্বল। নারী মনস্তত্ত্ব প্রকাশেও মুকুন্দরাম পিছিয়ে ছিলেন না ।প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় দুই সতীন লহনা খুল্লনার বিরোধের কথা। লহনা খুল্লনার বিরোধ বাধিয়েছে দাসী দুর্বলা যে দুই সতীনের বিরোধ বাধিয়ে দুজনের প্রিয় হয়ে উঠতে চায়-

"যেই ঘরে দুসতীনের না হয় কোন্দল/সে ঘরে যে দাসী বড় পাগল।।
একের করিয়া নিন্দা যায় অন্য স্থান/সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান।।"[২১]

ছোট ছোট আরো বেশ কিছু চরিত্রকে স্বতন্ত্রতা দান করেছেন মুকুন্দরাম তবে ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীল তার হাতে হয়েছে চিরজীবী। বাকচতুর ভাঁড়ুর শঠতার মধ্যে কোথাও যেন কৌতুক লুকিয়ে আছে যে কারণে সে পাঠকের সমর্থন পায়। আবার স্যাকরা মুরারি শঠ হলেও সে ভাঁড়ু দত্ত নয়। কালকেতু দেবীর কাছ থেকে পাওয়া সোনার আংটি তার কাছে বিক্রী করতে এলে সে ঠকানোর জন্য যে কথা বলে তা প্রবাদে পরিণত হয়েছে-

"সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল।"[২২]

পরিশেষে সেদিনের দেবী চণ্ডীর মতোই মুরারী শীলের এই উক্তিকে নস্যাৎ করে আমাদের বলতে হয় পিতল নয় মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে মুকুন্দরাম খাঁটি সোনা ছিলেন যা সময়ের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হয়ে আজও সমান উজ্জ্বল। শব্দচয়ন চরিত্র নির্ভর ভাষা প্রয়োগ মানবমুখীনতা সমন্বয়কামী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে তিনি যে কাব্যভাষা গড়েছেন

তা বর্তমান সময়েও আমাদের দিশা দেখায়। কেবল দেব মাহাত্ম্য প্রচার কাহিনির কারিগর তাকে বলা যায় না সবদিক থেকেই তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র তা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ১২৭
২. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ, পৃ. ৪১২
৩. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ, পৃ. ৪১৩
৪. পাল, সুব্রত, অভয়া দুর্গা এবং লৌকিক দেবী, চিঠিপত্র বিভাগ, আনন্দবাজার পত্রিকা
৫. সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ, কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল, গ্রন্থবিকাশ, কল-৭৩, পৃ. ৬৪
৬. ঐ, পৃ. ৬৪-৬৫
৭. ঐ, পৃ-৯৫
৮. ঐ, মুসলমানগণের আগমন, পৃ. ১০২
৯. ঐ, মুসলমানদের শ্রেণী বিন্যাস, পৃ. ১০৩
১০. ঐ, মুসলমানগণের আগমন, পৃ. ১০২
১১. পোদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, উচ্চারণ, কলকাতা, পৃ-৮৬
১২. মুখোপাধ্যায়, শ্রী নির্মলেন্দু, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা-৭৩, গ্রন্থ সূচনা, পৃ. ১৫
১৩. সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ, কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল, গ্রন্থবিকাশ, কল-৭৩, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির আগমন, পৃ. ১০৫
১৪. ঐ, ব্রাহ্মণগণের আগমন, পৃ. ১০৪
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ১২
১৬. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী বুক স্টল, কল-০৭, পৃ. ১৩৪-৩৫
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), মর্ডার্ণ বুক এজেন্সী, কল-৭৩, পৃ. ১৭৯
১৮. সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ, কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল, গ্রন্থবিকাশ, কল-৭৩, ভাঁড়ু দত্তের আবির্ভাব, পৃ. ১০১
১৯. ঐ, ভাঁড়ু দত্তের কপটবাণী, পৃ. ১২৯
২০. ঐ, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, পৃ. ৮৬
২১. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড), (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা-১৩, পৃ. ৪৪৯
২২. সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ, কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল, গ্রন্থবিকাশ, কল-৭৩, অঙ্গুরী বিক্রয়ের দর-কষাকষি, পৃ. ৮৭

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল, সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, গ্রন্থবিকাশ, কল-৭৩

২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,সুখময় মুখোপাধ্যায়,ভারতী বুক স্টল,কল-০৭
৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, আনন্দ, কল-০৪
৪. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডার্ণ বুক এজেন্সী, কল-৭৩
৫. মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ/দ্বিতীয় সংখা *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, সম্পাদনা-সত্যবতী গিরি, সনৎকুমার নস্কর, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কোল-৯
৬. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা-১৩
৭. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা-৭৩